কাঁদো, প্রিয় দেশ

ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড

শেখ হাসিনা

আল্লাহু...
হা ইয়া আলাস্ সালাহ্
.....
হা ইয়া আলাল ফালাহ
নামাযের দিকে এসো...
কল্যাণের দিকে এসো...

মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে, প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাচ্ছে– সে আহ্বান উপেক্ষা করে ঘাতকের দল এগিয়ে এলো ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য।

গর্জে উঠলো হাতের অস্ত্র। ঘাতকের দল হত্যা করলো স্বাধীনতার প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এ নরপিশাচরা হত্যা করলো আমার মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবকে। হত্যা করলো মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শেখ কামালকে, শেখ জামালকে, তাদের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। যাদের হাতের মেহেদীর রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেল। খুনিরা হত্যা করলো বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরকে। সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জামিল যিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দানের জন্য ছুটে এসেছিলেন। হত্যা করলো কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মকর্তাদের।

আর সব শেষে হত্যা করলো শেখ রাসেলকে যার বয়স মাত্র দশ বছর। বার বার রাসেল কাঁদছিল, 'মায়ের কাছে যাবো' বলে। তাকে বাবা-ভাইয়ের লাশের পাশ কাটিয়ে মায়ের লাশের পাশে এনে নির্মমভাবে হত্যা করলো। ওদের ভাষায় রাসেলকে Mercy Murder (দয়া করে হত্যা) করেছে–

ঐ ঘৃণ্য খুনিরা যে এখানেই হত্যাকাণ্ড শেষ করেছে তা নয়, এই সাথে একই সময়ে হত্যা করেছে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণিকে ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণিকে– হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, তার তের বছরের কন্যা বেবীকে। রাসেলের খেলার সাথী তার কনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের আরিফকে। জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ সন্তান চার বছরের সুকান্তকে। তার

ভ্রাতৃপুত্র সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত ও নান্টুসহ পরিচারিকা ও আশ্রিতজনকে। আবারো একবার বাংলার মাটিতে রচিত হলো বেঈমানীর ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেঈমানী করেছিল তারই সেনাপতি। ক্ষমতার লোভে, নবাব হওয়ার আশায়। ১৯৭৫ সালে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁরই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক, রাষ্ট্রপতি হওয়ার খায়েশে। ঘাতকের দলে ছিল কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহিউদ্দিন, খায়রুজ্জামান, মোসলেম গং। পলাশীর প্রান্তরে যেমন নীরবে দাঁড়িয়েছিল নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির গোপন ইশারায়–

১৯৭৫, এদিনও নীরব ছিল তারা, যারা বঙ্গবন্ধুর একান্ত কাছের, যাদেরকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ্বাস করে ক্ষমতা দিয়েছিলেন– যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল এতটুকু সক্রিয়তা বা ইচ্ছা অথবা নির্দেশ বাঁচাতে পারতো বঙ্গবন্ধুকে–খন্দকার মোশতাকের গোপন ইশারায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো তারা, এগিয়ে এলো না সাহায্য করতে। মীর জাফরের নবাবী কতদিন ছিল? তিন মাসও পুরো করতে পারেনি– খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ (যা সংবিধানের নব নীতিমালা লঙ্ঘন করে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্জিত) তিন মাসও পুরো করতে পারেনি।

আসলে বেঈমানদের কেউই বিশ্বাস করে না। এমনকি যাদের প্ররোচনায় এরা ঘটনা ঘটায়, যাদের সুতোর টানে এরা নাচে তারাও শেষ অবধি বিশ্বাস করে না। ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়। কিন্তু মানুষ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়? যুগে যুগে এ ধরনের বেঈমান জন্ম নেয় যাদের ক্ষমতালিপ্সা একেকটা জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। ধ্বংস ডেকে আনে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই খুনিরা হত্যা করেছে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যকে হত্যা করেছে। বাঙালি জাতির চরম সর্বনাশ করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে খুনিদের আইনের শাসনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করে পুরস্কৃত করেছে। আইনের শাসনকে আপন গতিতে চলতে দেয়নি। বরং অন্যায় অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছে। লালিত করেছে। যার অশুভ ফল আজ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে।

এই খুনিদের বাংলার মানুষ ঘৃণা করে! বঙ্গবন্ধুকে এরা কেন হত্যা করেছে? কী অপরাধ ছিল তাঁর? স্বাধীনতা– বড় প্রিয় একটি শব্দ, যা মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত থেকে দম ফেটে কে মরতে চায়? একদিন পাকিস্তান কায়েমের জন্য সকলে লড়েছিল। লড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুও। কিন্তু পাকিস্তান জন্মলাভের পর বাঙালি কী পেল? না রাজনৈতিক স্বাধীনতা, না অর্থনৈতিক মুক্তি।

বাঙালির ভাগ্যে কিছুই জুটলো না, জুটলো শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন এবং মায়ের ভাষা মুখের ভাষাও পাকিস্তানি শাসকরা কেড়ে নিতে চাইলো। বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি তার মায়ের মর্যাদা রক্ষা করলো। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয়ার নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকলো। দেশের সম্পদ পাচার করে বাঙালিকে নিঃস্ব করে দিয়ে বাইশটি পরিবার সৃষ্টি করে শোষণ অব্যাহত রাখলো।

আর বঙ্গবন্ধু মুজিব শোনালেন অমর বাণী স্বাধীনতা। দেখালেন মুক্তির পথ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জয় বাংলা–ঘোষণা করলেন বাঙালির বিজয়, জয় বাংলা–সেই তো তাঁর অপরাধ।

যে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর লীলাক্ষেত্র, জানোয়ারের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিলে যেমন সে হিংস্র হয়ে ওঠে, তেমনি হিংস্র হয়ে উঠল পরাজিত শত্রুরা। কারণ ঐ অমরবাণী ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠল সমগ্র বাঙালির শিরায়-উপশিরায়। প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানলো বাঙালির চেতনায়– ১৯৭১-এর ৭ মার্চে বজ্রনিঘাত কণ্ঠের অমর সে বাণী যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলো প্রতিটি বাঙালিকে। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে পরাজিত করে বাংলার দামাল ছেলেরা ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঐ পরাজিত শত্রুদের দোসর নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করলো যেন! পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। মুজিববিহীন বাংলাদেশের আজ কী অবস্থা? বঙ্গবন্ধু মুজিবের সারা জীবনের সাধনা ছিল শোষণহীন সমাজ গঠন। ধনী-দরিদ্রের কোনো ব্যবধান থাকবে না। প্রতিটি মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন আহার, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের সুযোগ পাবে।

সারা বিশ্বে বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তাকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। আর সেই লক্ষ্যে সারা জীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন, জেল-জুলুম অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছেন। ফাঁসির দড়িও তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে একচুল নড়াতে পারেনি। তাঁর এই আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শস্থানীয়।

কিন্তু আমরা কী দেখি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ঘাতকরা ক্ষান্ত হয়নি–আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান খাটো করা হচ্ছে। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়া হলো। যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করে গণতন্ত্র কায়েম করেছিল বাঙালিরা, সেই গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক জান্তার শাসন কায়েম করলো হত্যাকারীরা।

সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারালো। ভোট-ভাতের অধিকার বন্দি হলো সেনা ছাউনিতে। এদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র লুটেরাগোষ্ঠী। অবাধ লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এদের দুঃশাসনে প্রশ্রয় পেয়েছে দুর্নীতি ও চোরাচালানী। সামাজিক ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ভোগ-বিলাস, মাদকাসক্ত, উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টি করে অবাধে শোষণ চালাচ্ছে। আর বৃহৎ জনগোষ্ঠীরা অর্থাৎ এদেশের ৯০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বঙ্গবন্ধুর আমলে যে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬% তা এখন দাঁড়িয়েছে ১৫%, ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৩৭%, এখন প্রায় ৭০%! ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা দিতে হতো না– বর্তমানে খাজনা ও করের বোঝা অতিরিক্ত। ২২ পরিবারের পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে কয়েক শত পরিবার— অবাধ, লুটপাটের লীলাক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ ভাগ, এখন তা দাঁড়িয়েছে ২ ভাগেরও নিচে। আমদানি-রফতানির ব্যবধান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী পণ্যে দেশ ছেয়ে গেছে, দেশীপণ্য বাজারে বিকোচ্ছে না। অবাধ চোরাচালানীর ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে মদ, জুয়া, রেস ছিল নিষিদ্ধ, বর্তমানে ঘরে ঘরে মিনি বার বসেছে, বাজারে তো কথাই নেই। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মাদক চোরাচালানীর সুগম পথ আজ বাংলাদেশ। যার বিষাক্ত প্রক্রিয়া সমাজের অশুভ প্রভাব ফেলে কত তাজা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়াচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আজ চরম অবনতি ঘটেছে। বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবকরা চাকরির অভাবে হতাশাগ্রস্ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অস্ত্রবাজিতে ধ্বংস করা হচ্ছে। সরকারি মদদে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। বাজেটের সিংহভাগ চলে যায় অনুৎপাদনশীল খাতে, আর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যায় সব থেকে কম বরাদ্দ। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন দিশেহারা। অনাহার অপুষ্টিতে হাজার হাজার মানুষ ভুগছে। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই তো বর্তমান বাংলাদেশের চেহারা! স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে শুধু একটি মানুষের অভাবে। বাংলার মানুষের এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী এ খুনিরা, দায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা।

তাই এ হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করতে হবে। সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান না ঘটলে বাংলার মানুষের মুক্তি আসবে না। গণতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। আজ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবসে প্রতিটি বাঙালিকে শপথ নিতে হবে যে, বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবো। জনতার আদালতে খুনিদের বিচার করবো। ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটন করে বাংলার মানুষকে বাঁচাবো।